বুদ্ধিজীবী হত্যা ॥ বিচারহীনতার নীরবতা ভাঙতেই হবে

ডা. এম এ হাসান

বাংলাদেশে গণহত্যার সবচেয়ে বর্বর ও ঘৃণ্য অধ্যায়টি ঘটে মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে। বুদ্ধিজীবী হত্যার মূল পরিকল্পক ছিল মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। জামায়াতে ইসলামীর দফতর সম্পাদক মাওলানা এবিএম খালেক মজুমদারকে দেয়া হয়েছিল ঢাকার বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড সমন্বয়ের দায়িত্ব।

বুদ্ধিজীবী হত্যার একটি খসড়া পরিকল্পনা করে জামায়াতের আব্বাস আলী খান ও গোলাম আজম। এই পরিকল্পনা যথাযথ অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছিল রাও ফরমান আলীর নিকট। সেটা করেছিল গোলাম আজম নিজেই। তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছিল বদর বাহিনীর সদস্য আলী আহসান মুজাহিদ, মতিউর রহমান নিজামী, কামরুজ্জামান, মাঈনুদ্দীন, আশরাফুজ্জামান, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রধান এমরান, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি বিভাগের চিকিৎসক ডা. এহসান, বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের ইসলামী ছাত্রসংঘের নেতা জলিল। ফরমান আলীর পরিকল্পনা ও এদের কাজের মধ্যে সমন্বয় করছিল পাকিস্তানের ব্রিগেডিয়ার বশির ও ক্যাপ্টেন তারেক। ইপিসিএফ, ওয়েস্ট পাকিস্তান রেঞ্জার্স, পুলিশ ও রাজাকারের কিছু সদস্য এদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছিল। অনেক বিহারীরও এদের সাথে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করছিল। শান্তি কমিটির যে সব শীর্ষ নেতা এ কাজে তাদের ছায়া হয়ে কাজ করছিল তারা হলো– সৈয়দ খাজা খয়েরউদ্দীন, এ.কিউ.এম শফিকুল ইসলাম, গোলাম আজম, মাহমুদ আলী, আব্দুল জব্বার খদ্দর, মোহন মিয়া, মাওলানা সাইয়েদ মোহাম্মদ মাসুম, আব্দুল মতিন, গোলাম সরওয়ার, এএসএম সোলায়মান, একে রফিকুল হোসেন, নুরুজ্জামান, আতাউল হক খান, তোহা বিন হাবিব, মেজর আফসার উদ্দীন ও হাকিম ইরতেজাউর রহমান।

মুক্তির জন্য বাঙালীর প্রাণপণ লড়াইকে যখন কোনভাবেই আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না তখনই পাকিস্তান তার শেষ চাল হিসেবে বাংলাদেশকে প্রশাসনিক ও বুদ্ধিভিত্তিক কর্মক্ষেত্রে নিঃস্ব করে দেয়ার পরিকল্পনা করে। এ কারণে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবীকে হত্যার নীলনক্সা প্রণয়ন করে ঘাতককূল। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে পাকিস্তানীরা এদেশের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ারসহ শিক্ষিত শ্রেণীর বাঙালিকে হত্যার উদ্যোগ নেয়। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা প্রগতিশীল ছিলেন তাঁদেরকেই বিশেষ করে টার্গেট করা হয়।

অক্টোবর মাস থেকেই আলবদর বাহিনী বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রস্তুতি নেয়। নবেম্বর মাসে অনেক বুদ্ধিজীবীর কাছে তারা হুঁশিয়ারি পত্র পাঠাতে শুরু করে এবং মধ্য নবেম্বরে তাদের কর্মকাণ্ড শুরু করে। এটি ছিল বুদ্ধিজীবী হত্যার দ্বিতীয় পর্ব।

ঢাকার মিরপুর, মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় ব্রিগেডিয়ার রাজা, রমনা থানা এলাকায় ব্রিগেডিয়ার আসলাম, তেজগাঁও এলাকায় ব্রিগেডিয়ার শরীফ এবং ধানমণ্ডি এলাকায় ব্রিগেডিয়ার শফি ঢাকার বুদ্ধিজীবী হত্যায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। আলবদর হাইকমান্ড সদস্য আশরাফুজ্জামান খান এই বাহিনীর প্রধান ঘাতক ছিল বলে জানা যায়। ঢাকায় বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য বদর বাহিনীর পাঁচ শ' সদস্যকে নিয়োজিত করা হয়েছিল। ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭২ 'দৈনিক বাংলা'য় প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয় ১৯৭১ সনের মে মাসে কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীর কাছে ইয়াহিয়া সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ ফর্ম পাঠানো হয়। মনে করা হয়, এদের সম্পর্কে তল্লাশি চালানোর উদ্দেশ্যেই এই ফর্ম পাঠানো হয়েছিল। 'লন্ডন টাইমস' বাংলাদেশের শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, সাংবাদিক, আইনজীবী ও সাহিত্যিকদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা ফাঁস করে দেয়। ফলে পরিকল্পনাটি সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে।

'৭১-এর ২৬ মার্চ সকালে জগন্নাথ হলের হাউজ টিউটর অধ্যাপক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যকে আরও দু'জনের সাথে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের রিডার এএনএম মুনিরুজ্জামানকে তাঁর পরিবারের তিন সদস্যসহ শহীদ মিনার সংলগ্ন ৩৪ নং বাড়িতে হত্যা করা হয়। অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব ও অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকেও গুলি করা হয় সেদিন। জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে ২৭ মার্চ ঢাকা মেডিক্যালে নেয়া হয়। তাঁর পরিচয় জেনেই পাকিস্তানী বাহিনী গুলি করেছিল তাঁকে। জিসি দেবকেও হত্যা করে ফেলে রাখা হয়েছিল তাঁর নিজ গৃহে। এসব ছিল বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রথম পর্ব।

শিক্ষকদেরকে জাতির মাথা ও মেরুদণ্ড ভেবেই পাকিস্তানী বাহিনী তাঁদের সমূলে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘাঁটি তৈরির পর পাকিস্তানী বাহিনী পরিসংখ্যান বিভাগের কাজী সালেহ, গণিত শাস্ত্রের প্রভাষক মুজিবর রহমান, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানের ড. রফিক এবং বাংলা বিভাগের ড. আবু হেনা মোস্তফা কামালকে ধরে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালায়। তৎকালীন উপাচার্য সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন এ তালিকা প্রণয়নের ব্যাপারে পাকিস্তানী বাহিনীকে সাহায্য করে। সংস্কৃত ভাষার সহকারী অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দারকে হত্যা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে কাজলার পুকুরপাড়ের একটি গর্তে ফেলে রাখা হয়। ২৫ নবেম্বর মনোবিজ্ঞানের প্রভাষক মীর আব্দুল কাইয়ুমকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে যায় পাকিস্তানী আর্মির অনুগত উপাচার্যের স্টেনো তৈয়ব আলী। ৩০ ডিসেম্বর পদ্মার চরের বাবলা বনে পাওয়া যায় তাঁর লাশ। গণিত বিভাগের অধ্যক্ষ হবিবুর রহমানকে ১৫ এপ্রিল ধরে নিয়ে যাওয়া হয় ব্রিগেডিয়ার আসলাম ও কর্নেল তাজের অতিথি ভবনের ছাদে। পরে আর ফিরে আসেননি তিনি।

৯ জানুয়ারি, ১৯৭২ 'পূর্বদেশ'-এ প্রকাশিত রিপোর্টে একটি ডায়েরির কথা উল্লেখ করা হয়। সে ডায়েরিটি বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী আলবদর কমান্ডার আশরাফুজ্জামান খানের বলে উল্লেখ করা হয়। এই আশরাফুজ্জামান মিরপুর গোরস্থানে সাতজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে নিজ হাতে গুলি করে হত্যা করে বলে আগেই সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। যে গাড়িতে করে শিক্ষকদের নিয়ে যাওয়া হয় তার চালক মফীজ উদ্দীন পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তিতে এ তথ্য জানায়।

এ ডায়েরিটির দুটো পৃষ্ঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ জন বিশিষ্ট-শিক্ষক শিক্ষিকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক গোলাম মুর্তজার নাম ও ঠিকানার উল্লেখ ছিল। এই বিশ জনের মধ্যে ১৪ ডিসেম্বর যে ৮ জন নিখোঁজ হন তাঁরা হলেন– অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী (বাংলা), অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (বাংলা), অধ্যাপক আনোয়ার পাশা (বাংলা), ড. আবুল খায়ের (ইতিহাস), অধ্যাপক রশীদুল হাসান (ইংরেজী), অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদ (ইতিহাস), ড. ফয়জুল মহী (ইসলামী শিক্ষা) ও ডা. মুর্তজা।

এ ছাড়াও ডায়েরিতে যাঁদের নাম ছিল তাঁরা হলেন অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ (বাংলা), ড. নীলিমা ইব্রাহিম (বাংলা), ড. লতিফ (শিক্ষা), ড. মনিরুজ্জামান (ভূগোল), ড. সাদউদ্দীন (সমাজতত্ত্ব), ড. এএসএস শহীদুল্লাহ (গণিত), ড. সিরাজুল ইসলাম (ইসলামের ইতিহাস), ড. আখতার আহমদ (শিক্ষা), ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (ইংরেজী) এবং বাংলা একাডেমীর পরিচালক অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। এই ডায়েরিতে ব্রিগেডিয়ার বশির, ক্যাপ্টেন তারেকসহ অনেকের নাম ছিল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও ষোলোজন শিক্ষকের নাম ছিল যাঁদের কেউ নিখোঁজ হননি। এই শিক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন পাকিস্তানী বাহিনীর দালাল ড. মোহর আলী। বুদ্ধিজীবী হত্যার শেষ অধ্যায়টি শুরু হয় স্বাধীনতার মাত্র ক'দিন আগে ১০ ডিসেম্বর থেকে। এতে প্রথম শিকার হয়েছিলেন 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর বার্তা সম্পাদক সিরাজুদ্দিন হোসেন। এর পরপরই নিখোঁজ হতে থাকেন অনেকে। স্বাধীনতার আনন্দ ম্লান হয়ে যায় ১৮ ডিসেম্বর রায়েরবাজার বধ্যভূমি আবিষ্কারের পর। এখানে ইটখোলার মধ্যে পাওয়া যায় দেশের অনেক কৃতী সন্তানের লাশ। কারও চোখ-হাত বাঁধা, কারও চোখ তুলে নেয়া; কারও বুক চিরে উপড়ে নেয়া হয়েছে হৃৎপিণ্ড।

৫ জানুয়ারি মিরপুর গোরস্তানে মাটির নিচে পাওয়া গেল শ্রী সন্তোষ ভট্টাচার্য, ড. সিরাজুল হক, ড. ফয়জুল মহী, ডা. মুর্তজার লাশ। অন্য তিনটে লাশ ছিল ভয়ানকভাবে গলিত ও বিকৃত যা শনাক্ত করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। অন্যদিকে আলবদর বাহিনী কর্তৃক অপহৃত ইত্তেফাকের কার্যনির্বাহী সম্পাদক সিরাজুদ্দিন হোসেন, সংবাদের যুগ্ম সম্পাদক শহীদুল্লাহ কায়সার, সাবেক পিআইএর ব্যুরো চীফ ও বিবিসি সংবাদদাতা নিজামুদ্দিন আহমেদ ও চীফ রিপোর্টার সৈয়দ নাজমুল হকের লাশের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

আলী আহসান মুজাহিদ, কামরুজ্জামান ও নিজামী গংয়ের নেতৃত্বাধীন আলবদর বাহিনী বুদ্ধিজীবী হত্যায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তাদের অভিভাবক ও সহায়ক হিসেবে যারা কাজ করেছে তারা হলো মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী, ব্রিগেডিয়ার রাজা, ব্রিগেডিয়ার

শরীফ, ব্রিগেডিয়ার আসলাম, ব্রিগেডিয়ার শফি, ব্রিগেডিয়ার বশির, কর্নেল তাজ, ক্যাপ্টেন তারেক, তৈয়ব আলী, আশরাফুজ্জামান খান, এবিএম খালেক মজুমদার, চৌধুরী মাঈনউদ্দিন, ভিসি সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন ও ড. মোহর আলী।

এ প্রেক্ষাপটে ইন্টারপোলের মাধ্যমে আশরাফুজ্জামান খান ও চৌধুরী মাঈনউদ্দিনকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে প্রকৃত তথ্য বেরিয়ে আসবে। ইপিসিএফ-এর সদস্য কতিপয় ঘাতক বিহারীকেও খুঁজে পাওয়া যাবে।

প্রয়াত অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিনের ভগ্নি অধ্যাপক ফরিদার দায়েরকৃত মামলাটি সরকার আমলে নিলে আশরাফুজ্জামান খান সম্পর্কে একটি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। বুদ্ধিজীবী হত্যার রহস্য বের করতে হলে একটা জায়গা থেকে কাজটি শুরু করতে হবে। বিচারহীনতার নীরবতা আমাদেরকে ভাঙতেই হবে।

[লেখক : আহ্বায়ক, ওয়ার ক্রাইম্‌স
ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি]
ই-মেইল : aaersci@aitlbd.net

পরিকল্পিত বুদ্ধিজীবী নিধন ॥ ১৯৭১

যদিও যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন প্রশাসন, বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে, তথাপি স্বাধীন মার্কিন জনগণ ও গণমাধ্যম সেদিনকার পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে হানাদার পাকিস্তানীদের সমর্থন করেনি। তারা কঠোর নিন্দা জানায় পাকিস্তানী বাহিনীর গণহত্যার । ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ (তার আগে পরেও) আন্তর্জাতিক সংবাদ সাময়িকী 'নিউজউইক' যুদ্ধের শেষ পর্বের অর্থাৎ পাকিস্তান বাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীদের হাতে নির্বিচারে বাঙালী নিধনের সচিত্র বিবরণ প্রকাশ করে।

'নিউজউইক'-এ শিরোনাম ছাপা হয় 'ইন্ডিয়া এ্যাটাকস : দি ওয়ার ইন বেঙ্গল'। এই রিপোর্টে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার কর্তৃক পাকিস্তানের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের মোকাবিলায় ভারতের সিদ্ধান্তের কথা বর্ণনা করা হয়। দীর্ঘ প্রতিবেদনে মার্কিন সংবাদ সাময়িকী যুদ্ধের গতি-প্রকৃতির বয়ান দিয়ে মন্তব্য করে, চলতি যুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক সরকার বাংলাদেশ প্রশ্নে আদতে একটি পরাজয়ের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে।

'ইন্ডিয়া হোল্ড দি কার্ডস' শিরোনামে ম্যাগাজিনটি মন্তব্য করে, ভারতের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে পাকিস্তানী আদতেই পরাজয়ের মুখোমুখি। 'যেখানে পাকিস্তানের চেয়ে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী দ্বিগুণেরও বেশি (৯,৪০,০০০ ভারতের আর ৩৯২,০০০ পাকিস্তানের) এবং ভারতের যেখানে ৬১৫টি যুদ্ধ বিমান আর পাকিস্তানের মাত্র সেখানে ২৮৫টি, যেখানে গোটা যুদ্ধ পরিস্থিতিটা অবশ্যই ভারতের পক্ষে। অন্যদিকে বর্তমান যুদ্ধে ভারতের সহযোগী হয়েছে হাজার হাজার বাঙালো মুক্তিবাহিনী, যারা পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর কবল থেকে নিজেদের মাতৃভূমিকে উদ্ধার করতে চাইছে।'

'নিউজউইক'-এর ভাষ্য আরও যে, চলতি পরিস্থিতিতে বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর কারও কথাই কোন পক্ষ শুনতে চাইছে না। ওয়াশিংটন যদিও দু-পক্ষকেই ধৈর্য ধারণ করার আহ্বান জানিয়েছে, কিন্তু কোনো পক্ষই নিক্সন প্রশাসনের কথা শুনেনি। ভারতে অবশ্য পরিস্থিতি আরও গোলমেলে। এর একটি কারণ হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাকিস্তানে নিয়মিতভাবে অস্ত্রের চালান গেছে। নতুন দিল্লীতে একজন সরকারী কর্মকর্তার মন্তব্য হচ্ছে এ-রকম : "মজার ব্যাপার হচ্ছে, একদিকে তোমাদের দেশ থেকে আমরা হাতে পাচ্ছি অস্ত্র সম্বরণ করার মধুর উপদেশ, অন্যদিকে পাকিস্তানকে তোমরা পৌঁছে দিচ্ছ তোমাদের আধুনিক মারণাস্ত্র।" তবে বলাই বাহুল্য, পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে যেভাবে গণহত্যা চালিয়েছে, যেভাবে নারী নির্যাতন করেছে, এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যেভাবে গোটা বিশ্ব বাঙালিদের স্বাধীনতার সমর্থনে চষে বেরিয়েছেন, তাতে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া বিশ্বজনমত ভারতের যুক্তির পক্ষেই গেছে।

এ সময় ঢাকা থেকে পাঠানো সাংবাদিক নিকোলাস টমালিনের যে রিপোর্টটি 'নিউজউইক' প্রকাশ করেছে তা এ-রকম : "গত বৃহস্পতিবার (১৬ ডিসেম্বর) তারা (পাকিস্তানীরা) যখন আত্মসমর্পণ করে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাদের স্থানীয় দোসররা ঢাকায় কমপক্ষে পঞ্চাশজন বুদ্ধিজীবী-শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়ীকে নির্বিচারে হত্যা করে। এ হত্যাকাণ্ডগুলো ছিল পরিকল্পিত–যাতে তারা বাঙালী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে সহিংসপন্থায় শেষ করে দিতে চেয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই হত্যাকান্ডগুলী যুদ্ধরত পাকিস্তানী সৈন্যদের হাই কমান্ড, এমন কি জে. নিয়াজির অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েই ঘটেছে।"

'নিউজউইক' আরও লিখেছে, "এই নিহতের দেহগুলি যখন আবিষ্কৃত হবে তখন মুক্তিবাহিনীর মধ্যে আরও বেশি উত্তেজনার সৃষ্টি হবে। হয়ত তারা আরও বেশি প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে উঠবে– এমনকি সে উত্তেজনা মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যেও ঝামেলা বাঁধাতে পারে।"

এই আন্তর্জাতিক সাময়িকীর প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, "এই সব নিহত বাঙালী বুদ্ধিজীবীকে ঢাকার কাছে রায়েরবাজারের একটি জায়গায় খুঁজে পাওয়া যায়। আমি নিজে সেখানে ৩৫টি মৃতদেহ গুণে দেখি। ধারণা করা যায়, চার কি পাঁচদিন আগে এদের এখানে এনে খুন করা হয়। হয়ত এমনি দেহ আরও অনেক জায়গায় আছে। কারও কারও ভাষ্য মতে, এই সংখ্যা কম করে হলেও ১৫০ জন হবে।" সে সময় আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা ইউপিআই-এর ঢাকা ডেট-লাইনে পাঠানো এক প্রতিবেদনে কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়। এরা হচ্ছেন, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের প্রধান কার্ডিওলজিস্ট ড. ফজলে রাব্বি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী।

"এই ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডগুলি ঘটানো হয়েছে ঢাকার অদূরে মধ্যবিত্ত এক নিচু জলাশয়ের মতো জায়গায়। জায়গাটা এক অর্থে যথেষ্ট নিরিবিলি এবং কর্দমাক্ত। ... আমি দেখলাম হারানো স্বজনদের খোঁজে শত শত মানুষ এখানে এসে ভিড় করেছে। এরা সকলেই তাদের হারিয়ে যাওয়া পরিজনদের খুঁজছে। ... কিন্তু রায়ের বাজারের এই বধ্যভূমিতে আমি যা লক্ষ করলাম– তা হচ্ছে– বাঙালী জনতা এখানে এসে উন্মত্ত হয়ে উঠলোনা, আগে যেভাবে তারা প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠতো, মোটেও সেভাবে নয়। আমি দেখলাম, তারা নীরবে-নিঃশব্দে নিজেদের আত্মীয়দের খুঁজছে । একজন আরেকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে, যেভাবে কবরস্থানে এসে লোকজন একজন আরেকজনের সাথে কথা বলে ।"

"... একটি বধ্যভূমিতে এসে দেখলাম এখানে আগের গুলোর চেয়ে অনেক বেশি মানুষ। মৃতদেহও অনেক বেশি এখানে। এখানেই দেখা হলো একজন মুসলমান লোকের সঙ্গে। ওর মুখে একটি উলের চাদর দিয়ে বাঁধা। মনে হলো সে যেন একজন মুয়াজ্জিন, যে নামাজের জন্যে আহ্বান জানায়। আমরা লোকটার নাম জানতে চাইলাম। সে বলল, যে আবুল মালিক, ঢাকারই এক ব্যবসায়ী। সামনের যে জলাশয় রয়েছে তাতে সে তার তিন ভাইয়ের দেহ শনাক্ত করতে পারলো– বদরুজ্জামান, শাহজাহান ও মুলুক জাহান। লাশগুলো পাশাপাশি পড়েছিল। ওরাও ঢাকাতেই ব্যবসা করত। আব্দুল মালিকের আর কোন ভাই নেই।"

নিকোলাস টমালিনের সেই হৃদয় বিদারক বর্ণনা আরও এরকম : "আবুল মালিক জানালো, 'পাক-আর্মি' এদের জন্য বুধবার ভোর ৭টায় আসে। ঘটনাক্রমে আমি সেদিন বেশ সকালে বেরিয়ে যাই।" মালিক যখন তার কথা বলছিল তখন আমার সহযোগী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র নাজিউর রহমান, কাঁদতে শুরু করল। ওই আমাকে রায়েরবাজারের এই ইটখোলায় নিয়ে এসেছিল। কারণ আরও ছিল। নাজিউর নিজেও তার বোন-জামাইকে খুঁজছিল।

"... ড. আমিনউদ্দিন ছিলেন বেঙ্গল রিসার্স ল্যাবরেটরির প্রধান। তিনি একজন পিএইচডি। তাকে শেষবারের মতো দেখা গেছে বুধবার সকাল ৭ টায় যখন পাকিস্তান আর্মি তাকে তুলে নিয়ে যায়। নাজিউর কাঁদতে কাঁদতে আমাকে জানালো, 'কিছু মনে করবেন না । আপনার সাথে আর আমি থাকতে পারবনা । আমার দুলাভাইকে খুঁজতে হবে।' নাজিউর এরপর তার উলের মাফলারটি দিয়ে আরও শক্ত করে মুখ ঢাকল।"

... গতকাল (ডিসেম্বর ১৬) আমি মাত্র তিন ঘণ্টার জন্য ঢাকায় ছিলাম। সে সময়ই সুসংবাদটি ছড়িয়ে পড়ল। দেখলাম জনতার মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। তারা মুক্তিবাহিনী ও তাদের মিত্র ভারতীয় সৈন্যদের দিকে হাত তুলে অভিনন্দন জানাচ্ছে।" ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর দিন কয়েক আগে মূলত পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয় বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের। নিচে তাদের একটি তালিকা দেয়া হলো :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : জি. সি. দেব, মুনীর চৌধুরী, মোজাম্মেল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, আব্দুল মুকতাদির, রাশেদুল হাসান, ড. এএনএম ফয়জুল মাহী, ফজলুর রহমান খান, এএনএম মুনিরুজ্জামান, ড. সিরাজুল হক খান, ড. শাহাদত আলী, ড. এমএ খায়ের, এআর খান কাদিম, মোহাম্মদ সাদেক, শরাফত আলী, গিয়াসউদ্দিন আহমদ, আনন্দ পায়ান।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : অধ্যাপক কাইয়ুম, হবিবুর রহমান, সুখরঞ্জন সমাদ্দার।

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক : সিরাজুদ্দিন হোসেন, জহির রায়হান, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, ইন্দু সাহা ও মেহেরুন্নিসা, শহীদুল্লাহ কায়সার, খোন্দকার আবু তালেব, নিজামুদ্দিন আহমেদ, এএনএম গোলাম মোস্তফা, শহীদ সাবের, ফেরদৌস দৌল্লাহ, নাজমুল হক, এম. আখতার, আবুল বাসার, চিশতি হেলানুর রহমান, শিবসদন চক্রবর্তী , সেলিনা আক্তার।

ডাক্তার : ফজলে রাব্বি, আব্দুল আলিম চৌধুরী, শামসুদ্দিন আহমেদ, আজহারুল হক, হুমায়ুন কবীর, সুলাইমান খান, কায়সার উদ্দিন, মনসুর আলী, সেলিম মর্তুজা, হাফেজউদ্দিন খান জাহাঙ্গির, আব্দুল জব্বার, এসকে লাল, হেমচন্দ্র বসাক, কাজী ওবায়দুল হক, মিসেস আয়সা বিদৌরা চৌধুরী, আলহাজ মমতাজউদ্দিন, হাসিময় হাজরা, নরেন ঘোষ, জিকরুল হক, শামসুল হক, এম রহমান, এ. গফুর, মনসুর আলী, এস কে সেন, মুফিজুদ্দিন, অমূল্য কুমার চক্রবর্তী, আতিকুর রহমান, গোলাম সারওয়ার, আরসি দাশ, মিহির কুমার সেন, সালেহ আহমদ, অনিল কুমার সিনহা, সুশীল চন্দ্র শর্মা, একেএম গোলাম মোস্তফা, মকবুল আহমদ, এনামুল হক, মনসুর (কানু), আশরাফ আলী তালুকদার, লে. জিয়াউর রহমান, লে.ক. জাহাঙ্গির, বদরুল আলম, লে.ক. হাই, মেজর রেজাউর রহমান, মে. নাজমুল ইসলাম, আসাদুল হক, নাজিরউদ্দিন, লে. নুরুল ইসলাম, কাজল ভদ্র, মনসুরউদ্দিন।

শিল্পী ও পেশাজীবী : আলতাফ মাহমুদ, দানবীর রনদাপ্রসাদ সাহা, যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শামসুজ্জামান, মাহবুব আহমেদ, খুরশিদ আলম, নজরুল ইসলাম, মোজাম্মেল হক চৌধুরী, মহসীন আলী ও মুজিবুল হক।

[১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার উদ্‌যাপিত প্রথম বিজয়
দিবস বার্ষিকীতে প্রকাশিত স্মরণিকা থেকে উদ্ধৃত]

দি এডিটর-এর সৌজন্যে

বইমেলার স্মৃতি

হারুন চৌধুরী, ওয়াশিংটন থেকে

অমর একুশে বইমেলা আমাদের ভাষাআন্দোলনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মূলত বইমেলার যাত্রা শুরু হয়েছিল একুশের পথ ধরেই। বাংলা একাডেমীর প্রাঙ্গণে দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ দশকে এই বই মেলা কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, প্রকাশক ও পাঠকদের এক মহামিলন মেলায় পরিণত হয়েছে। বপ্রবাসী হয়ে দীর্ঘদিন আমেরিকায় বসবাস করায় দেশের অনেক অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বঞ্চিত। তবে ২০০১ সালের বইমেলায় না গেলে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভবই হতো না।

প্রায় চার বছর যাবত প্রস্তুতি নিচ্ছি অমর একুশে বইমেলা উপলক্ষে আমার 'এই নারী' গ্রন্থ প্রকাশ করার। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপি লেখা শেষ করতে প্রায় পাঁচ বছর সময় লেগে যায়। লেখা শেষ হওয়ার পর ২০০১ সালে রজানুয়ারি মাসে দেশে যাবার প্রস্তুতি নিই।

এই উদ্দেশ্যেই আলেক্সজান্দ্রিয়ায় অবস্থিত স্কাই ট্রাভেলসের মুসা ভাইয়ের কাছ থেকে গলফ এয়ারের টিকেট সংগ্রহ করলাম। লন্ডন হয়ে ঢাকায় যেতে হবে। আমার ছোট ভাইয়ের মত নবী ও আক্তার বিকেল বেলা প্রতিকূল আবহাওয়ায় আমাকে ওয়াশিংটন ডালাস এয়ারপোর্টে নিয়ে এলো। আমার ডান দিকের সিটের ভদ্রলোক একজন ব্রিটিশ নাগরিক। তাঁর কথায় বোঝা গেল দিনের আলো বিদায় নিয়েছে এবং সন্ধ্যা নেমেছে। চারদিক বৈদ্যুতিক বাতির আলোয় এয়ারপোর্ট ঝলমল করছে। বাইরে চেয়ে দেখি তুষারপাত হচ্ছে। র‍্যাম্পের ডানার ওপর পড়ছে তুষার। র‍্যাম্পের লোকেরা ডি-আইচ মেশিন দিয়ে বরফ পরিষ্কার করছে। প্রায় দুই ঘন্টা বিলম্ব করে বিশাল প্লেনটা আকাশে উড়ল। আট ঘন্টা আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ভোরের কুয়াশা কেটে ভোরবেলা লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে এসে প্লেন অবতরণ করল। লন্ডনে মেঘলা আকাশ, তার উপর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ও শৈত্যপ্রবাহ। এমন আবহাওয়া যেন লন্ডনবাসীর নিকট নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার। কয়েক ঘন্টা বিরতির পর আবার গলফ এয়ারে চাপলাম। এবারও জানালার পাশেই গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পর এয়ার হোস্টেজ আমার পাশের সিটে একজন ভিন্ন ধরনের যাত্রীকে এনে বসাল। যাত্রীরা যখন বোডিং কার্ড নিয়ে যার যার সিট নাম্বার মিলিয়ে দেখা নিয়ে ব্যস্ত আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল এয়ার হোস্টেজের ওপর। সে একজন যাত্রীকে সাথে নিয়ে একটা হ্যান্ড ব্যাগ হাতে বহন করে আমার দিকে আসছে। আমি মনে মনে বললাম আর যাই হোক এই পাগল লোকটা যেন আমার পাশের সিটে না বসে। ক্ষণিকের মধ্যেই চেয়ে দেখি এয়ার হোস্টেজ আমার পাশের নাম্বারের সাথে তার বোর্ডিং কার্ডের নাম্বার মিলাচ্ছে। তার পর যা হবার তাই হলো। এলোমেলো চুল, বড় বড় শশ্রুমণ্ডিত লম্বা ওভারকোট হাতে মধ্য বয়সী ভদ্রলোক অর্ধ-ফোকাল লেন্সের চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে একবার তাকিয়ে আমার পাশের আসনে এসে বসলেন। তিনি আসনের সামনের ফোল্ডার থেকে ম্যাগাজিন হাতে পেয়ে পাতা উল্টাতে লাগলেন। আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। তন্দ্রা যখন ভেঙ্গেছে তখন টের পাই প্রায় চল্লিশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ে প্লেন বহু দূরের পথ পার হয়ে এসেছে। চোখ মেলে চেয়ে দেখি পাশের সেই লোকটা, যাকে প্রথমেই দেখে মনে মনে অপছন্দ করেছিলাম, তিনি এক হাতে ডিনারের ম্যানু আর এক হাতে অরেঞ্জ জুশের গ্লাস নিয়ে অপেক্ষা করছেন। আমি তাঁর দিকে তাকাতেই অন্য কিছু না বলে তিনি বললেন দিস্ ইজ ইউরস। আমি তাঁকে থ্যাঙ্ক ইউ বলে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম।

২২ জানুয়ারি ২০০১ রবিবার ভোরবেলা গলফ এয়ার নিজ মাতৃভূমি বাংলাদেশের মাটিতে অবতরণ করল। বিমানবন্দরের সকল ফরমালিটিজ সেরে ব্যাগেজ কাউন্টারে এসে জানলাম বিরোধী দল (চার দল) সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডেকেছে। বেষ্টনীর বাইরের দিকে সকলেই উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে কেউ নিতে এসেছে কিনা। আমিও খোঁজ করছি আমার আত্মীয়স্বজন কেউ এসেছে কিনা। চেয়ে দেখি আমার ভাগনী শেফালীর জামাই এ্যাডভোকেট দেলোয়ার ও আসমার জামাই শাখাওয়াত দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে এসে ওদের জিজ্ঞেস করলাম কি করে যাব? ওরা আমার বাসায় যাবার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করে রেখেছে। বলল এ্যাম্বুলেন্স। এ্যাম্বুলেন্সের কথা শুনে অবাকই হলাম। হরতালের সময় একমাত্র সংবাদপত্রের গাড়ি ও এ্যাম্বুলেন্স ছাড়া কোন গাড়ি রাস্তায় চলাচল করতে পারে না। অগত্যা এ্যাম্বুলেন্সে করে রোগী হয়ে বাসায় পৌঁছলাম। পরদিন সকালে দেলোয়ারের বন্ধু হাতেখড়ির প্রকাশক আমার 'এই নারী' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নিয়ে গেলেন। ২ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বইমেলা উদ্বোধন করলেন বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণের খোলা আকাশের নিচে। এই অনুষ্ঠানে চেনা অচেনা অনেকের সঙ্গেদেখা হলো। দেশের বিশিষ্ট বরণ্য ব্যক্তিসহ কবি সাহিত্যিক, গায়ক, লেখক ও প্রকাশকরা উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ কয়েক যুগ পর আমার স্কুলের এক প্রাক্তন ছাত্রের সাথে দেখা। সে এখন একজন ব্যাংকের কর্মকর্তা। একাডেমীর বর্ধমান হাউজ চত্বরে বইয়ের স্টলগুলোকে দেখে মনে হলো যেন আমি আমার ছাত্র জীবনে ফিরে গিয়েছি। বইয়ের স্টলগুলো বাংলা একাডেমীর চারপাশ ঘিরে তৈরি করা হয়েছে। বইমেলার লেখক কুঞ্জে কবি, সাহিত্যিক, লেখক, প্রকাশকদের প্রতিদিন ভিড়। নতুন বইয়ের উদ্বোধন মানেই মোড়ক উন্মোচন। মনে পড়ে, ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি একজন তরুণ কবির বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেছিলেন আমাদের দেশবরেণ্য কবি শামসুর রাহমান।

ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে আমার লেখা গ্রন্থ 'এই নারী'র প্রকাশনা উৎসব হলো। একজন প্রবাসী লেখক হিসেবে দেশে গিয়ে সবার সহযোগিতা পেলাম। বইটির ওপর প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখলেন। পরদিন দেশের প্রত্যেকটা জাতীয় দৈনিকে ছবিসহ সংবাদ ছাপা হয়। দৈনিক জনকণ্ঠ লিখল একুশের বইমেলা জমে উঠেছে। এই নারী গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন লেখক, কবি ও প্রাবন্ধিক অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। বক্তব্য রাখলেন ভাষাসৈনিক এ্যাডভোকেট গাজীউল হক, ড. মুনতাসীর মামুন, ড. এনায়েত রহিম, এ্যাডভোকেট ও লেখিকা শাহীদা বেগম, ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন, হাতে খড়ির প্রকাশক আবু মুসা, আমার ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে অত্যন্ত প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব এ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন নারীনেত্রী খুশী কবির। ঢাকা ব্যুরোর ঠিকানা পত্রিকা থেকে সংবাদ কভারেজ দেবার জন্য এসেছিলেন পল্লব। অতি স্বল্পভাষী যুবক। আমার সাথে

প্রবাস জীবন নিয়ে অনেক কথা হলো। ভাবতে অবাক লাগে সেই পল্লব আজ আর বেচে নেই। ঠিকানা পরিবারের সকলকে চোখের জলে ভাসিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছে।

আমার মনে হয় বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের বইমেলার সময় কয়েকটি বিষয়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। দু'বেলা পানি ছিটিয়ে মাঠ ভেজা রাখতে হবে। এতে মেলার পরিবেশ থাকবে ধুলাবালিমুক্ত। ফলে বইপ্রেমীরা স্বস্তি বোধ করবেন। এছাড়া এমনভাবে স্টল দেয়া ঠিক হবে না যাতে বইপ্রেমীদের চলাফেরায় অসুবিধা হয়।

আমেরিকায় ঠিকানা পত্রিকাসহ অন্য পত্রিকাগুলো প্রতিভাবান লেখকদের প্রবন্ধ কবিতা ও কলাম ছেপে তাদের উৎসাহিত করে আসছে। শত ব্যস্ততার মাঝেও কিছু কিছু পাঠক বই পড়তে ভালবাসেন। বাংলাদেশের সেই নেশাটা তাঁরা প্রবাসেও ছাড়তে পারেননি। তাঁদের অনেকের মধ্যে থেকেই প্রবাসে সৃষ্ট হয়েছে আজ কিছু সৃজনশীল লেখক। একজন সম্পাদকের সহযোগিতায় নতুন সৃষ্টির ডালপালায় একজন লেখক পায় ভালবাসা, পায় সম্মান। জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায় তাঁর লেখা প্রকাশে। একজন লেখকের এর চেয়ে আর বড় পাওয়া কী হতে পারে?

[লেখক : প্রবাসী সাংবাদিক]
HChowdhury@ATPCO.NET

অনেক থেকে এক

স্টার্টিং পয়েন্ট সিলেট। প্রেরণার আগুনে দুরন্ত রকেট সৈয়দ মুজতবা আলী। কলমে অপূর্ব আলো। বিশ্বের কুর্নিশ। গতি অবাধ। মনের কোণ থেকে সুদূর প্রান্তে। বিষয় বৈচিত্র্যের দ্যুতি। মনটা চারদিকে ছড়ানোর আপত্তি ছিল আর্থার কোনান ডায়েলের। সব দেখতে গেলে কোনটাই ভাল করে দেখা হয় না। রবীন্দ্রনাথ মানেননি। অসমর্থন মুজতবা আলীরও। অনেক দর্শনে এককে চেনা। ভালবাসাতেও তাই। বহুর মধ্যে বিশেষকে বেছে নেয়া। মুজতবা আলীর পায়ের তলায় সরষে। জেরুজালেম, কাবুল, দামাস্কাস, আমেরিকা, ইউরোপ সফরে সমৃদ্ধ মনন। 'দেশে-বিদেশে'তে দেখার বিবরণ। পঞ্চতন্ত্র, 'চাচা কাহিনীতে প্রমাণিত তিনি শুধু সাহিত্যিক নন, ভাষাবিদও। কাজের জগৎ সুবিস্তৃত। বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষ, আইসিসিআরের সম্পাদক, কটক রেডিও স্টেশনের অধিকর্তা ছাড়াও অফুরন্ত দায়িত্বে। মানুষ একটা নাম অনেক। সত্যপীর, রায় পিথৌরা আরও কত কি। তাঁর ভাষণ মানে মানুষ ধরার জাল। চলে গেছেন ১৯৭৪-এ। কথা ফুরোয়নি। ক্যাসেটবন্দী ভাষণ 'বাইশে শ্রাবণ'। অচেনা ছন্দে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার। 'গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন'-এর মতো গোটা বইয়ে যা লিখতে পারেননি তাই বলেছেন অনুপম কণ্ঠে। মৃত্যুর তেত্রিশ বছর ফের কথা সদ্য প্রকাশিত ক্যাসেট সঙ্কলনে।

সম্পর্ক কতদূর

ভারতে এত লোক থাকতে জন্মদিনে দেবানন্দকে ডাকলেন কেন হিলারি ক্লিনটন। বন্ধুত্ব নেই, দেখা-সাক্ষাত হয়নি কোনও দিন। অথচ আচমকা আমন্ত্রণ। নিউইয়র্কের বার্থ ডে পার্টিতে মুখোমুখি হতে তাকানোর ভঙ্গিটা এমন যেন কতদিনের চেনা। দু'জনের দৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন রোমান্টিকতা। ঠোঁটে হাসির রেখা টেনে হিলারির প্রথম কথা, আমি কিন্তু ষাট। দেবানন্দের প্রমট উত্তর, আমার চুরাশি। বয়সটা ফ্যাক্টর নয়। মনটা সবুজ। অতিথিরা অবাক। যেন রোমাঞ্চকর নাটক দেখছে। সম্পর্কটা কতদূর এগোয়, তাই নিয়ে সাসপেন্স। দেবানন্দের কালো চুল, হিলারির সোনালি। ঠোট দু'জনের কালো। দেবানন্দের মাই এক্সপেরিয়েন্স উইথ রোমান্স' হিলারি পড়েছেন। সুরাইয়াকে দেবানন্দ সত্যিই কতটা ভালবাসতেন জানার আগ্রহ। হিলারির সটান প্রশ্ন সুরাইয়াকে হারানোর বেদনা আজও কী মনে বাজে? আরব সাগর জানে। ইন্ডিয়ান-আমেরিকান বিজনেসম্যান সন্ত চাতওয়ালের হস্তক্ষেপে নাটক অসমাপ্ত। বিনয়ের সঙ্গে আর্জি। ম্যাডাম আপনি ব্যস্ত। বাকি কথা পরে হবে। আমাদের যাওয়ার অনুমতি দিন। পার্টি থেকে বেরুতেই সাংবাদিকদের খপ্পরে দেবানন্দ। বুকে আঁটা হিলারির ছবিওয়ালা ব্যাজ দেখিয়ে প্রশ্ন, এটা কী এভাবেই আঁটা থাকবে? আমার আত্মজীবনীর পরের এডিসনে জবাব পাবেন।

মিশ্র ভৈরবি

সিনেমার গানে ফেরা পারভীন সুলতানার। বিক্রম ভাটের '১৯২০' তে খানদানী গান। চিনির কথা। কণ্ঠ সৌকর্যে প্রতিটি দানা পৃথক বৈশিষ্ট্যে চেনা। মিশ্র ভৈরবি থেকে কিরওয়ানি। সুর আদনান সামির। পারভীনের ডাইহার্ড ফ্যান। রেকর্ডিং মাত্র ২০ মিনিট। অবাক এ্যারেঞ্জাররা। সরোদ, সান্তুরের সঙ্গে পিয়ানো, গিটার। পশ্চিমী ইনস্ট্রুমেন্টে আপত্তি নেই। সঙ্গীতে যেন অসম্মতি না থাকে। ছবিতে পণ্ডিত যশরাজও গেয়েছেন। পারভীনের সন্তোষ, ধ্রুপদী সঙ্গীত স্বস্থানে ফিরছে। 'ফিউসন' পছন্দ নয়। বলেছেন, ক্ল্যাসিকাল মিউজিক মা, ফিউসন ছেলেমেয়ে। মাকে সব সময় মানে না। গজলের মতো খেয়ালি চালে চলা। নৌশাদ, মদন মোহন, শচীন দেব বর্মণ, রাহুল দেব বর্মণের সুরে গেয়েছেন। তার পর দীর্ঘদিনের বিরতি। গানের প্রথম পাঠ বাবা ইক্রামুল মজিদের কাছে। দ্বিতীয় গুরু চিন্ময় লাহিড়ী। তৃতীয় ওস্তাদ দিলসাদ খানের তত্ত্বাবধানে। পরে বিয়ে দিলসাদকেই। পারভীনের সাফ কথা, পতি পরম গুরু। কলকাতার ডোভার সঙ্গীত সম্মেলনে গান গাওয়াতেই বেশি খুশি ফি বছর হয়ে ওঠে না। দু'বছরে একবার মাস্ট। রাত ফুরনোর মুখে গান ধরা। শহরের জেগে ওঠা।

আশ্চর্য ইমেজ

১৯৬২-এর চীন-ভারত যুদ্ধে অস্বস্তি। সতর্ক আমেরিকা। কূটনৈতিক অঙ্কে অমিল। বিহ্বল বিশ্ব। হঠাৎ হলিউড ম্যাটিনি আইডল ম্যারিলিন মনরোর মৃত্যুর খবর। সিনেমা জগতে ভূমিকম্প। অসুখ-বিসুখ কিচ্ছু না। মাত্র ছত্রিশে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আমন্ত্রণ। রাতের ডিনার না সেরে বেডরুমে একটার পর একটা স্লিপিং পিল গলধঃকরণ। আশ্চর্য প্রস্থানে শোকের ছায়া। বৃষ্টিশূন্য প্রশ্নের মেঘ। রহস্য ঘনীভূত। মরণের ৪৫ বছর পর ফের মনরো নয়ন সম্মুখে। স্বমূর্তিতে নয়, ভাবমূর্তিতে। মনরো এখনও তরুণী। রেশম কোমল চুল। দৃষ্টিতে আচ্ছন্নতা, বাঁকা ঠোঁটে জমাট না বলা কথা। ভাবমূর্তি সযত্নে রক্ষা করার দায়িত্ব উত্তরাধিকারের। নতুন আইনে স্পষ্ট ঘোষণা, মনরো সবার ভালবাসার। তাঁর ছবি, অবিস্মরণীয় ইমেজ যত্নে রক্ষার দায়িত্ব সরকারের নয়, উত্তরাধিকারীর। তাদের অনুমতি ছাড়া মনরোর কোন ছবি প্রদর্শিত হবে না। রে চার্লস আর মারলোন ব্র্যান্ডের ছেলেমেয়েরা প্রতিবাদী। বলেছে, শিল্পীর উত্তরাধিকার ফ্যামিলি বহন করতে পারে না। সেই দায়িত্ব নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের। মনরোর পারফিউম, হ্যান্ডব্যাগ, বিজ্ঞাপন থেকে এ বছর আয় ৮০ লাখ ডলার কার হাতে যাবে তা নিয়েও বিতর্ক। বিক্রি স্থগিত। কলকাতার শপিং মলে মনরো পারফিউমের চাহিদা তুঙ্গে। যোগান নেই।